[redacted]; [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

আড্ডায় ফিরে আসে।

অথচ এই মানুষটিই প্রতিবছর রথযাত্রার বড় একটি ব্যয়ভার বহন করতেন। ব্যক্তিগত জীবনের মিতব্যয়িতা আর জনকল্যাণে উদারতার এই বৈপরীত্য তাঁকে আজও স্মরণীয় করে রেখেছে। রথযাত্রাকে ঘিরে নায়েববাড়ি প্রাঙ্গণে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত জমজমাট মেলা বসত। সেখানে মাটির খেলনা, কাঁচের চুড়ি, মিষ্টি, নাগরদোলা ও নানা ধরনের দোকানে মানুষের ভিড় লেগে থাকত। পরে মেলার স্থান পরিবর্তন হয়ে সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির এলাকায় চলে যায়।

আর ২০০৪ সাল থেকে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন)-এর নেতৃত্বে মেহেরপুর শহরের হরিসভা মন্দির থেকে নিয়মিত রথযাত্রা বের হয়ে আসছে। ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় থাকলেও সময়ের সঙ্গে এর আয়োজনের ধরনে এসেছে পরিবর্তন। আমি নিজেই স্বাধীনতাপূর্ব এবং পরবর্তী সময় প্রায় প্রতি বছরই এই রথমেলায় উপস্থিত থাকার ভাগ্যবান একজন। তাই চোখের সামনে বদলে যেতে দেখা এই উৎসব শুধু ইতিহাস নয়, ব্যক্তিগত স্মৃতিরও অংশ।

মেহেরপুরের রথযাত্রার পূর্ণাঙ্গ লিখিত ইতিহাস এখনও সংরক্ষিত হয়নি। অথচ এটি কেবল একটি ধর্মীয় উৎসবের ইতিহাস নয়; এটি এই জনপদের সামাজিক সম্প্রীতি, লোকঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক বিবর্তনেরও দলিল। প্রবীণদের স্মৃতিচারণ, পুরোনো আলোকচিত্র ও স্থানীয় নথি সংগ্রহ করে এই ইতিহাস সংরক্ষণ করা এখন সময়ের দাবি।

মেহেরপুর বরাবরই বহু ধর্ম ও সংস্কৃতির সহাবস্থানের জেলা। প্রবীণদের স্মৃতিচারণে উঠে আসে, রথযাত্রার দিনে শুধু সনাতন ধর্মাবলম্বীরাই নয়, মুসলিম পরিবারও মেলায় অংশ নিত। কেউ দোকান দিতেন, কেউ নাগরদোলায় উঠতেন, কেউ আবার পরিচিতদের সঙ্গে রথ দেখতে আসতেন। এই সামাজিক মেলবন্ধনই রথযাত্রাকে কেবল ধর্মীয় উৎসবের সীমায় আটকে রাখেনি; বরং এটি ছিল জনপদের সম্মিলিত সাংস্কৃতিক আয়োজন। কেন হারিয়ে গেল সেই জৌলুস? এর একক কোনো কারণ নেই।

দেশভাগের পর জনসংখ্যার পরিবর্তন, গ্রাম থেকে শহরে মানুষের সরে আসা, ঐতিহ্যবাহী মেলার জায়গায় আধুনিক বিনোদনের বিস্তার, রথ নির্মাণের ব্যয় বৃদ্ধি, দক্ষ কারিগরের সংকট এবং লোকঐতিহ্য সংরক্ষণে দীর্ঘদিনের অবহেলাÑসব মিলিয়েই মেহেরপুরের রথযাত্রা আজ অনেকটাই সংকুচিত।

তবু প্রশ্ন রয়ে যায়Ñযে জেলার মানুষ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি

সংরক্ষণে গর্ববোধ করে, সেই জেলায় লোকঐতিহ্যের এমন গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় কেন নথিভুক্ত হলো না?

মেহেরপুরে দুর্গোৎসবের ঢেউ:

অতীতের আলো, বর্তমানের

আশ্বাস

পঁচাত্তর বছরেরও আগে, মেহেরপুরের গ্রামের মাঠে, কলার খুঁটির ছায়ায় গড়া হত দুর্গামণ্ডপ। প্রতিমা তখন মাটির নয়নজুড়ে সীমাবদ্ধ থাকলেও, বিশ্বাসের দীপ্তি ছিল অপার। ধানের খেত থেকে ফিরে আসা কৃষকেরা যেমন হাতে মাটির ঢেলা নিয়ে দেবীর সামনে দাঁড়াতেন, তেমনি সন্ধ্যার আলোয় গ্রামের শিশুরা আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকত রঙিন কাগজের ঝালর আর মাটির প্রদীপে।

কালের পরিক্রমায়, সেই মণ্ডপে এখন উঠে এসেছে থার্মোকল-তুলির বাহার, বৈদ্যুতিক আলো আর ডিজিটাল ঢাকের শব্দ। তবে, রয়ে গেছে একটি অদৃশ্য সুতো যা ধর্মকে ছাপিয়ে মানুষে মানুষে মিলনের উৎসবে পরিণত করেছে দুর্গাপূজাকে।

চলতি বছর, মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলায় (সদর, গাংনী ও মুজিবনগর) মিলিয়ে ৪৩টি দুর্গাপূজার মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। মণ্ডপগুলোর প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায়ে কোথাও রঙতুলির শেষ আঁচড়, কোথাও লাইটিংয়ের পরীক্ষামূলক চালনা।

শহর থেকে গ্রাম সবখানেই যেন দেবী পূজাকে ঘিরে ছুটে চলেছে উৎসবের বাতাস। হালদারপাড়া, ভবেরপাড়া, আনন্দবাস, দারিয়াপুর, ভবানীপুর প্রতিটি জায়গাতেই আলাদা আবহ, আলাদা আয়োজন। তবে এক জায়গায় সবার মিল, ভক্তি আর সম্প্রীতির মেলবন্ধন।

পূজাকে ঘিরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে জোরদার পদক্ষেপ। জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে আইনশৃঙ্খলা কমিটির বিশেষ সভা, যাতে অংশ নিয়েছেন

জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তারা, পূজা উদযাপন পরিষদের নেতারা এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। সভায় নিশ্চিত করা হয় প্রতিটি মণ্ডপে নিরাপত্তা দিতে থাকবে আনসার সদস্য, অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিজিবির সহায়তা। যা ইতোমধ্যে গত বৃহস্পতিবার থেকে কার্যকর হয়েছে।

স্থানীয় রাজনীতিকদের মধ্যে বেশ ক’জন ইতোমধ্যেই বিভিন্ন মণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন। মণ্ডপ উদ্বোধন, দান বা শুভেচ্ছা জানানোর ঘটনা একাধিক। যদিও সরাসরি কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে অর্থায়নের তথ্য মেলেনি, তবে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহানুভূতি ও উপস্থিতি সমাজে ইতিবাচক বার্তা দিচ্ছে। এবারই প্রথম পূজোর একটি উল্লেখযোগ্য দিক রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে একযোগে অংশগ্রহণ।

জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব অশোক চন্দ্র বিশ্বাস বলেন, দলের চেয়ে বড় উৎসব, ধর্মের চেয়ে বড় মিলন। এখানে আসলে সবাই এক, আমরা শুধু দেবী দুর্গার আশীর্বাদ চাই সব মানুষের মঙ্গল হোক। তবে, আশার পাশে ছিলো কিছু চ্যালেঞ্জও। শহর এলাকায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট ও অতিরিক্ত ভিড় সামলানো এক সমস্যা, আবার গ্রামাঞ্চলে রয়েছে প্রতিমা পরিবহন ও বাজেট সংকট। যা প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সব ধরণের সহায়তা করছে।

মেহেরপুর জেলা কালি মন্দিরের পুরোহিত তপন বন্দোপাধ্যায় বলেন পূজা মানে শুধু ধর্ম নয়, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য আর সামাজিক বন্ধন। যত দিন যাচ্ছে, ততই অর্থসঙ্কটে পূজার মহিমা হারিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। যদিও এবার সে সমস্যা নাই। প্রতিমার চোখে এখনো দেখা যায় এক ধরনের শান্ত বিশ্বাস যেন সব কিছুর পরেও, মানবতা ও শুভবোধের জয় হবেই। ঢাকের তালে তালে, সিঁদুরের উজ্জ্বলতায়, সন্ধ্যার আরতিতে, আজও জেগে থাকে সেই চিরচেনা মেহেরপুর যেখানে উৎসব মানেই একসঙ্গে থাকা, ভেদাভেদের দেয়াল গুঁড়িয়ে দেওয়া।

গৃহবধূ পল্লবী সাহা বলছেন, পুজো মানেই নতুন শাড়ি, সিঁদুর, মিষ্টি, আর নতুন আলপনার ছোঁয়া। সন্তানদের খুশি করতেই এখন একটু হিসেব করে চলতে হয়। তবুও উৎসব থেমে থাকে না। কারণ পুজো তো শুধু কেনাকাটা নয়, এ এক আবেগ, এক ঐতিহ্য।

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী জানিয়েছেন প্রতিটি মণ্ডপে থাকবে পুলিশ, আনসার, গ্রাম পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবক। ট্রাফিক ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে। এছাড়াও

মণ্ডপে স্থাপন করা হয়েছে সিসি ক্যামেরা, সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলোতে যানজট নিরসনে কাজ করছে অতিরিক্ত ফোর্স।

জেলা প্রশাসক মো. আবদুল সালাম বলেন, উৎসব যেন নির্বিঘ্নে, শান্তিপূর্ণভাবে এবং উৎসবমুখর পরিবেশে পালিত হয়, সে বিষয়ে আমরা সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নিয়েছি। দেবীর দশভুজায় যেন স্থান পায় অসাম্প্রদায়িক চেতনা, যেন তাঁর অস্ত্র শুধু মহিষাসুর নয় বিভেদের কালো ছায়াকেও নির্মূল করে এমনটাই প্রত্যাশা আমাদের।

রাজনীতির শ্রমিক: আদর্শহীন আনুগত্যের নতুন নাম

দেশের রাজনৈতিক পরিসর এক আশ্চর্য রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। গণতন্ত্রের চর্চা, মত প্রকাশের অধিকার ও জনগণের অংশগ্রহণ এখন অনেকটাই প্রতীকী। এর পরিবর্তে সামনে এসেছে এমন একটি বাস্তবতা, যেখানে রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে একটি বিশেষ শ্রেণি “রাজনীতির শ্রমিক”। এরা আদর্শের নয়, আনুগত্যের ভিত্তিতে রাজনীতিতে সক্রিয়; এবং তাঁদের রাজনৈতিক ভূমিকা অধিকাংশ সময়েই সীমাবদ্ধ থাকে ক্ষমতার পক্ষে শ্রম প্রদান ও প্রতিপক্ষ দমনে সক্রিয় অংশগ্রহণে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন নেতৃত্বের সংকট এখন গভীর বাস্তবতা। স্বাধীনতার পর থেকে এদেশের রাজনীতিতে বেশ কয়েকটি প্রজন্ম নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এক ধরনের স্থবিরতা লক্ষণীয় নেতৃত্ব কাঠামো পুরোনো, মুখ একই, কণ্ঠস্বরও চেনা। প্রশ্ন উঠছে: আজকের তরুণেরা কোথায়? ভবিষ্যতের নেতৃত্ব কোথা থেকে আসবে?

এক সময়ের ছাত্র রাজনীতি ছিল স্বাধীনতার সংগ্রাম, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মূল প্ল্যাটফর্ম। আজ তা অনেক ক্ষেত্রেই সহিংসতা, চাঁদাবাজি ও দলীয় আজ্ঞাবহতায় পরিণত হয়েছে। আদর্শিক রাজনীতির জায়গায় এসেছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপার্জনের চিন্তা। ফলে তরুণদের মধ্যে রাজনীতিকে ক্যারিয়ার হিসেবে দেখার

আগ্রহ কমে গেছে। যেসব তরুণ এখন নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারাও বিতর্কে জড়িয়ে পড়ছেন।

শেখ হাসিনা দীর্ঘ সময় ধরে শাসন ব্যবস্থায় থাকার ফলে মাঠপর্যায়ে এক ধরনের ‘দলভিত্তিক শ্রম বাজার” গড়ে উঠেছে। এখানে রাজনীতিকরা আদর্শিক বক্তব্য দেন না; বরং নেতা কী বলছেন, তা অন্ধভাবে অনুসরণ করাই যেন একমাত্র কাজ। শোডাউন, মিছিল, পোস্টার লাগানো, এমনকি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার চালানো পর্যন্ত সবই এখন একপ্রকার পেশা, যার বিনিময়ে পাওয়া যায় পদ, সুযোগ বা সরাসরি আর্থিক সুবিধা।

এই ধরনের রাজনীতি শ্রমিকদের কাছে রাজনীতি হলো লেনদেনের মাধ্যম আদর্শ নয়, বরং সুবিধার সূত্র।

বিরোধী রাজনীতির শ্রমিক সংকট। ওইসময়, বিরোধী দল বিশেষ করে বিএনপি ও বাম ধারার দলগুলো রাজপথে সক্রিয় শ্রমিক-কর্মী হারিয়ে ফেলে। কোটা বিরোধী আন্দোলনে কেষ হাসিনা সরকারের পতনের পরে সেই সংকট কাটিয়ে ওঠে বিএনপি। এখন বিএনপিতে রাজনীতির শ্রমিকে জয় জয়কার। এখানে আদর্শে বিশ্বাসী কিছু মানুষ এখনও আছেন, তবে তাঁদের সক্রিয়তা তুলনামূলকভাবে কম।

এ বাস্তবতায় দেখা যায়, শ্রমিক-কেন্দ্রিক রাজনীতি শুধু ক্ষমতাসীন পক্ষেই নয়, বিরোধীতায়ও এক ধরনের শূন্যতা সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতি একসময় ছিল চিন্তার মঞ্চ, নেতৃত্ব গড়ার প্ল্যাটফর্ম। আজ তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রূপ নিয়েছে সংঘবদ্ধ পেশাগত কর্মকাণ্ডে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে ছাত্র সংগঠনের নামে চলে টর্চার সেল, চাঁদাবাজি, নিয়ন্ত্রণের লড়াই। ছাত্ররা শিক্ষার্থী নয়, বরং নেতা ও উপরের মহলের ‘বিশ্বাসভাজন কর্মী’ হয়ে ওঠে এবং সেটাই তাদের “রাজনৈতিক যোগ্যতা”। তাদের মধ্যে অনেকে বছরের পর বছর ছাত্রত্ব বজায় রেখে রাজনীতি করে চলেন একটা ‘ক্যাডার সংস্কৃতি’র প্রতিনিধিত্ব করেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনীতির এক নতুন মঞ্চ তৈরি হয়। যেখানে রাজনৈতিক শ্রমিকরা ফেসবুক পোস্ট, ইউটিউব লাইভ, বা ভিডিও কনটেন্টের মাধ্যমে ‘নেতার পক্ষে’ কথা বলেন, বিরোধী মতকে আক্রমণ করেন। তাঁদের অনেকেই এই কাজের বিনিময়ে আর্থিক উপার্জন বা সুযোগ সুবিধা পান।

জনসংখ্যার বড় একটি অংশ তরুণ। এরা যদি রাজনীতির বাইরেই থাকে, তাহলে নেতৃত্বের সংকট কেবল আরও গভীর হবে। রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে একসঙ্গে কাজ করে নেতৃত্ব তৈরির সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। ভবিষ্যতের রাজনীতি যেন কিছু মুখ বা পরিবারের হাতে না আটকে থাকে, বরং হয়ে ওঠে জনসম্পৃক্ত, দায়বদ্ধ এবং নবীন নেতৃত্বনির্ভর সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।

লেখক ও সাংবাদিক

সামাজিক অনুষ্ঠান হোক লৌকিকতা বিবর্জিত

আমাদের স্বজন মাহবুবুল হক মন্টু ও ফাতেমা বিনতে রাশেদ জ্যোতি দম্পতির একমাত্র সন্তান ফাইয়াজ আবদুল্লাহ সুবর্ণ‘র প্রথম জন্মবার্ষিকী ছিলো এক ডিসেম্বর ২০২২। হোটেল লা-ভোগে ছিলো জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান। নিমন্ত্রিতও ছিলাম। লৌকিকতা বর্জণ বিষয়টি আগে ভাগেই জানিয়ে দেয়। এই দম্পতির অনুরোধ উপেক্ষা করবো এমন সাধ্যি আমার নেই। কিন্তু বিপাকে পড়লাম অনুষ্ঠানে গিয়ে। অনেকের লৌকিকতা বর্জন বারণ না মানাতে।

কিছুদিন আগে একটি সংবাদপত্রের পাতায় একটি সত্য ঘটনার বিবরণ পড়েছিলাম কোন একজন লেখিকার লেখায়। তিনি ছিলেন ওই ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী। লেখিকা তাঁর এক আত্মীয়ের ছেলের বিয়েতে গিয়েছিলেন নিমন্ত্রিত হয়ে। মেজবান গৃহকর্তা তার নিমন্ত্রণপত্রের শেষে ‘বিশেষ দ্রষ্টব্য’ উল্লেখ করে লিখেছিলেন: ‘সকল প্রকার লৌকিকতা অবশ্যই বর্জনীয়।’

নিমন্ত্রিত বেশীরভাগ মেহমানই নিমন্ত্রণপত্রের নির্দেশ মেনে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কেউ কেউ লোক চক্ষু লজ্জার খাতিরে হোক, কিংবা পুরনো অভ্যাসবশত হোক, কিছু না কিছু উপঢৌকন নিয়ে এসেছিলেন। এই বিবাহ অনুষ্ঠানে উপঢৌকন গ্রহন করার কোন টেবিল ছিলো না। তবুও গৃহকর্তা প্রবেশ দ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে যে সব মেহমান দাওয়াতপত্রের দ্রষ্ট্রব্যের কথা বা অনুরোধ অগ্রাহ্য

শুনি নিকটাত্বীয় হলে অনুষ্ঠানের ব্যয়ভারে অংশ নিতে হয়। ধর্মীয় দিক থেকে এই অনুষ্ঠান করা নাকি ঠিক না। যারা চল্লিশায় ভুরিভোজ করবেন তারও নাকি পাপির দলে পড়বেন। বিনা টাকায় এই দাওয়াত গেলাও বন্ধ করেছি পাপি না হতে।

কোন বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন, কর্মশালা ইত্যাদি বিষয়ে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অনেক সময় নির্ধারিত সংখ্যা উল্লেখ করে আমন্ত্রন জানান। সেসব অনুষ্ঠানে গিয়ে বিপাকে পড়ি আমাদের পেশার সহযোদ্ধাদের সংখ্যাতত্ব না মানার কারণে। কাপড়ে মুখ ঢাকতে ইচ্ছে করে যখন দেখি নিমন্ত্রিত না হবার পরেও উপস্থিত সহযোদ্ধা অনুষ্ঠান শেষে এক প্যাকেট খাবারের জন্য ঝগড়া করে।

সামাজিক অনুষ্ঠানের লৌকিকতার ছোঁয়া এখন শহর ছেড়ে গ্রাম জীবনকেউ স্পর্শ করেছে। বিয়ে-শাদিতে উপহার দেয়ার রেওয়াজ গ্রামেও ছিলো কিন্তু সেখানে এখন জন্মদিন ও ম্যারেজ ডে বা বিবাহ বার্ষিকী অনুষ্ঠানের ঢেউও জেগেছে। এখন কি শহর কি গ্রামে, এসব সামাজিক অনুষ্ঠানে কাউকে দাওয়াত দেয়ার অর্থই ধরে নেয়া হয় খাওয়া উঠিয়ে আমন্ত্রিত অতিথিদের থেকে বাড়তি কিছু আশা। এ ধরনের দাওয়াতের কার্ড পেয়ে তাই আজ আর কেউ খুশি হন না, বরং মনে মনে প্রমাদ গোনেন। এই অবস্তায় সবচেয়ে মুশকিলে পড়েন গরীব আত্মীয়রা। তাঁরা আজকাল সাধ্যমত চেষ্টা করেন সেব অনুষ্ঠান বর্জন করতে।

সম্প্রতি মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার একটি পরিবার তাদের প্রথম সন্তানের জন্মবার্ষিকীতে ঢাকঢোল পিটিয় অনুষ্ঠান করে। লৌকিকতাতে বেশ লাভবানও হয়। ছয়মাসের ব্যবধানে ২য় একমাত্র মেয়ের জন্মবার্ষিকী পালন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিতদের সিকিভাগ অতিথিও উপস্থিত হয়নি। ওই পরিবারটি এনিয়ে বেশ কষ্ট পেয়েছে লাভবান হতে না পারার দুখে।

তথাকথিত এই সামাজিক লৌকিকতা শেষ পর্যন্ত দেখছি অপরাধ বিস্তারেও ইন্ধন যোগাচ্ছে। এক ছিনতাইয়ের সময় দুুই যুবক আটকের খবর ঢাকার সবকটি সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে। ধরা পড়ার পর যুবকদ্বয় পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছে, বন্ধুর জন্মদিনে ভালো একটা উপহার কিনে দেয়ার জন্যেই তারা ছিনতাইয়ের পথ বেছে নিয়েছিল।

যে জন্মদিনের অনুষ্ঠান এখন ভালো মানুষকেউ ছিনতাইকারী বানাচ্ছে তেমন জন্মদিনের অনুষ্ঠান বাদ দেয়া উচিত কিনা সেটা একটু ভেবে দেখা দরকার। ঠিক এমনি করেই ম্যারেজ ডে, মুখে ভাত, নাক ফোঁড়ানী, কান ফোঁড়ানী প্রভৃতি অনুষ্ঠান বাদ দেয়ার কথা ভেবে দেখা দরকার।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকেও এসব অনুষ্ঠানের কোন মূল্য বা স্বীকৃতি নেই। ছিনতাইকারী যুবকেরা একজনের পকেট থেকে ছিনতাই করেছিল, কিন্তু সমাজের ভদ্রলোকরা সামাজিক ও লৌকিকতার নামে ভদ্রতার ছদ্মাবরণে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের পকেট কাটছে। বড় ব্যবসায়ী, যাদের অঢেল অর্থ আছে তাদের বেলা এ ধরনের লৌকিকতা কোন ব্যাপারই না। যারা সরকারী-বেসরকারী চাকুরে এবং উপরি-টুপরি পান তাদের বেলাও এটা তেমন সমস্যা না। আমাদের মতো যাদের উপরি নাই, সত্যিই বলছি- ঘরের খেয়ে আমরা যারা বনের মহিষ তেড়ে বেড়ায় তাদের জন্য বড় কষ্টের।